জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

বুলেটিন নং ৯, ২য় বর্ষ, বৃহস্পতিবার, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯২

THE JUMMA SAMBAD BULLETIN

Newsletter of the Parbattya Chattagram JanaSamhati Samiti (JSS),

Issue 9, 2nd year, Thursday 31st Dec. 1992.

6 December 1992

... ... **Press release** ... ...

Bangladesh massacre report—another official cover-up ?

Six international organisations unite in condemning government policy

In a report just received by internaional orgnisations, the Bangladeshi government still refuses to acknowledge the extent of massacre in which about 1,200 people were killed. On 10 April, 1992 the village of Logang in the Chittagong Hill Tracts was razed to the ground in a attack by security forces and Bengali settlers-indigenous Jumma villagers including women and children were locked in their homes and burnt alive. The Jummas, who live in the Chittagong Hill Tracts, have been the victims of 20 years of gross human rights violations perpetrated by the security forces. The government has been moving Bengali settlers on to their ancestral lands under their transmigration policy and is trying to wipe the Jummas out as a people.

Though not an isolated incident, the Logang massacre was one of the most horrific atrocities of recent times. An eyewitness at the time stated "Homes were set on fire and the village became a cremation ground". Such accounts were ubstantiated by a mateur film-makers who filmed the burnt remains of the village. Pressure by international organisations and doner aid agencies forced the Bangladeshi government to institute a judicial enquiry into the massacre. Its findings have recently been released.

The one-man commission of Justice Sultan Khan conducted the enquiry. A twenty-five page English version of his report has been released. At a meeting in Holland, Jumma representatives and several international organisations evaluated the report and the recent developments in the Hill Tracts. They said "Justice Khan's investigation of the massacre is completely inadequate. The Bangladeshi government has to stop its policy of genocide against the Jumma people". The report was found to be full of contradictions and to be in line with the military analysis of the massacre. For example, it admits to a mass killing by the military and Bengali settlers on April 10 but repeats the official death-toll given at the time : 12 Jummas and 1 settler. The report accepts that the relationship between the Jummas and the settlers is a violent one, but recommends that the government provide the settlers with more arms. Amnesty International has described the report as too vague and brief.

The current situation in the Hill Tracts is extremely alarming. The Bangladesh government is presently holding talks with the JSS (Jana Samhata Samiti) to negotiate a political solution to the conflict. The JSS is the main political party of the Jummas. Past negotiations have mainly been a public relations exercise to quell international protest. A Jumma representative at the meeting said. "We live under constant threat of genocide. This is the moment for the government to restore democracy in the Chittagong Hill Tracts. Otherwise we will cease to exist."

Even as negotiations take place, the government has plans for the Hill Tracts which will result in further dispossession of the Jummas and an icreased military presence. There are plans for an Asian Development Bank funded afforestation project which would displace about 40,000 Jumma families. as well as for military installation to be built on 11,000 acres of recently acquired land in Bandarban district. Of even greater concern are the government's plans to conduct a cadastral survey i. e. re-evaluate the existing land holding system. This will effectively legalise the take over of Jumma lands by Bengali settlers.

Across the border in India over 50,000 Jumma refugees fleeing persecution live in camps in Tripura. They continue to face acute shortages of food and medicine, They may now be forced to return to Bangladesh as the Indian government plans to cut off their meagre rations by 31 December, 1992.

This is joint release by Jumma representatives and the following organisations :
Organising Committee Chittagong Hill Tracts Campaign, Jumma Peoples Network, UNPO, CHTCIN, IWGIA, Survival International.

সম্পাদকীয়

জুম্ম জনগণের বিগত ২১ বৎসরের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে ১৯৯২ সালটি এক বিশেষ তাৎপর্যময় বছর। রক্ত-স্রোত পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে উষ্ণ রক্তের স্রোতধারায় গতি সঞ্চার হয়েছে এ বছরের শুরুতে। ২রা ফেব্রুয়ারীর মাইল্যা গণহত্যার ফলে গিরিকন্যা মৎস্যাধার কাচালং নদীর জল হয়েছে রঞ্জিত, ১০ই এপ্রিলের লোগাং গণহত্যায় বিজুর সকল আনন্দ উচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে যায় এবং স্বজন হারানোর ব্যথা বেদনায় জুম্ম জনতা বিমূঢ় হয়ে পড়ে—বিশ্ব বিবেক হতবাক না হয়ে পারেনি। এ দু'টো হত্যাকাণ্ডের রক্তের দাগ মুছতে না মুছতে ২০ মে রাঙ্গামাটির শানবাঁধা কালো রাজপথ জুম্ম রক্তে হয়ে পড়ে পিচ্ছিল আর ১৩ই অক্টোবরে মাইনীর ইস্পাত ব্রিজ হয়ে উঠে রক্তে রঞ্জিত।

জুম্ম জনগণের উপর বাংলাদেশ সরকারের এই জঘন্য হত্যা-কাণ্ড ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছে জুম্ম জাতীয় সত্তার বিলুপ্তির সাম্প্রতিকতম অপচেষ্টা। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত বর্তমান ক্ষমতাসীন বি, এন, পি সরকারের গণতন্ত্রের আচ্ছাদনে সাম্প্রদায়িকতার চরম বহিঃপ্রকাশ। এটা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুসৃত পূর্বতন সরকারের পদাংক অনুসরণের ধারা। যে ধারায় নিরপরাধ হাজারোধিক জুম্মকে প্রাণ দিতে হয়েছে, হাজার হাজার জুম্ম পরিবারকে নিজ বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদ হতে হয়েছে, শত শত জুম্ম নারী পাশবিকতার শিকার হয়েছে, ৫০ হাজারের অধিক জুম্ম নর-নারীকে দীর্ঘ ছয় বৎসর যাবৎ বিদেশের মাটিতে মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে আর সমগ্র জুম্ম জনগণ নিজ দেশে গ্রামবন্দী—পরবাসী হয়ে অনিশ্চিত জীবন কাটাচ্ছে।

কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের এসব অন্যায় অবিচার, অত্যাচার ও সকল প্রকার মানবাধিকার লংঘনেও জুম্ম জনগণের আন্দোলন থেমে থাকেনি। বিগত অনবচ্ছিন্ন ২১ বৎসরের বীরোচিত প্রতিরোধ ও আত্মত্যাগের ফলে জুম্ম জনগণের এই আন্দোলন আজ স্বদেশে ও বিদেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে, বিশ্বের সকল মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব, সংস্থা ও সরকারের সহানুভূতি অর্জন করেছে। ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক চাপে সরকার এবার লোগাং হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে (যদিও এই তদন্ত রিপোর্টটি বাস্তবতা বর্জিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত)। যা ছিল সরকারের সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ও গর্হিত অথচ অবশ্যকরণীয়। এছাড়া গঠিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত সরকারী কমিটি এবং গত ৫ই নভেম্বর শুরু হয়েছে জন সংহতি সমিতির সাথে সরকারের আলাপ-আলোচনা যা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকামী জুম্ম জনগণেরই অদম্য সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ।

পরিশেষে বলা যায়, এ বছরটি জুম্ম জনগণের জীবনে চরম বিষাদের ছায়াপাত ঘটালেও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের সূচনাও ঘটিয়েছে জনসংহতি সমিতি ও সরকারের আলোচনার মাধ্যমে। জুম্ম জনগণ আশা করে যে, উভয় পক্ষের শুভ সদিচ্ছার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার বাস্তব সমাধান হবে, সকল অত্যাচার, অবিচার ও শোষণের অবসান ঘটবে। তাই এই শুভ প্রক্রিয়ার প্রত্যাশায় অনাগত ১৯৯৩ সালকে জানাই স্বাগতম। ১৯৯৩ সালটি বয়ে আনুক আন্দোলনের সফলতাকে। জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ভূমির অধিকার, সংস্কৃতিসহ অন্যান্য সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হোক।

লোগাং তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ঃ

সরকারী বয়ানের বাড়তি প্রলেপ

—শ্রীউদয়ন

এক

গত ৭ই অক্টোবর লোগাং তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সেনাবাহিনী ও অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা সংঘটিত পাইকারী জুম্ম হত্যার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ এটাই সর্বপ্রথম। এর পূর্বে কলমপতি, লংগদু গণহত্যাসহ জুম্মদের উপর সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় বা সরকারী তদন্ত কমিশন কেবলই গঠিত হয়েছিল, রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। সেই সুবাদে বর্তমান খালেদা জিয়া সরকার ও এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান—সদস্য বিচারপতি সুলতান হোসেন খানকে সাধুবাদ দিতেই হয়। অবশ্য দেশ-বিদেশের প্রবল জনমতের চাপে পড়েই সরকারকে এই অনিচ্ছাকৃত কাজটি যে করতে হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিচারপতি সুলতান হোসেন খান তাঁর তদন্ত রিপোর্টটি ২০শে আগষ্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছিলেন। কিন্তু কোন এক রহস্যজনক কারণে দীর্ঘ দেড়মাস পরেই তা প্রকাশিত হলো। অধিকন্তু তিনি যে রিপোর্ট পেশ করেছেন, হাস্যকরভাবে তা সরকারী বক্তব্যের সাথে কোন তফাৎ নেই। দু'টি ভাষোর আগাগোড়াই হুবহু মিল রয়েছে। তাই হেসে বিবিসি বাংলা অনুষ্ঠানের এক সাক্ষাৎকারে সাংবাদিক কর্তৃক উক্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে এভিডেন্স এণ্ড সারকামস্ট্যানসেসই তা প্রমাণ করেছে এবং সরকারের বক্তব্য বাস্তবভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ বলে পাশ কেটে যেতে তিনি ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো—তাঁর তদন্ত কতটুকু নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন? পেশকৃত সুপারিশ কতটুকু বাস্তবভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ?

দুই

প্রথমেই বিচারপতি সুলতান হোসেন খানের চিহ্নিত গণহত্যার সূত্রপাতের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। তিনি গণহত্যা সূত্রপাতের কারণ নির্ণয়ের সারমর্ম টেনেছেন এভাবে—"লোগাং এর ঘটনা বিদ্রোহীদের পরিকল্পিত উদ্দেশ্যের ফলশ্রুতি। সশস্ত্র শান্তিবাহিনীরা গ্রামের পার্শ্ববর্তী মাঠে গরু চরানোর সময় আক্রমণ করে কবির নামক এক বাঙালী ছেলেকে হত্যা ও অপর দু'জনকে মারাত্মকভাবে আহত করে। এবং এর লক্ষ্য ছিল বাঙালী এবং উপজাতীয়দের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করা।" (পৃঃ ১৬)

তিনি ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন প্রধানতঃ লোগাং গুচ্ছগ্রামে কর্মরত ভি ডি পি, আনসার, অকুস্থলের মুসলমান অনুপ্রবেশকারী, পানছড়ি অঞ্চলের সেনা ও বেসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি ব্রিগেড কম্যাণ্ডার প্রমুখ সাক্ষীদের সাক্ষ্যকে নির্ভর করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো কতিপয় প্রাসঙ্গিক কারণে তাদের সাক্ষ্য কতটুকু নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ? এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

খাগড়াছড়ির অধিবাসী শোভা চাকমা তার স্বামী ১৯৮৬ সনের গণহত্যায় নিহত হলে প্রাণের ভয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নেয়। অসংখ্য লোমহর্ষক ঘটনার মধ্যে তার স্বামীর মৃত্যুর করুণ কাহিনীও দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রচার লাভ করে এবং এতে বিভিন্ন প্রভাবশালী ফোরামে সরকারের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ উঠে। এই নাজুক অবস্থার মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকার 'ফার ইষ্টার্ণ ইকনমিকস্ রিভিউ'এর সাংবাদিক ডেভিস ডেড়েককে খাগড়াছড়িতে এনে একজন ভাড়াটে শোভা চাকমা উপস্থিত করে এবং তার স্বামীর মৃত্যু হয়নি বলে ঐ নকল শোভাকে সেনা ও বেসামরিক কর্মকর্তারা বলতে বাধ্য করে। এ রকম ভুরি ভুরি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। নিজেদের হীন কার্যকলাপ ধামাচাপা দেয়ার জন্য এবং হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য স্থানীয় সেনা ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের দিয়ে সরকার প্রতিনিয়তই ঐরূপ ষড়যন্ত্রমূলক বানোয়াট উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ গোয়েবলীয় কায়দায় প্রচার করে আসছে। লোগাং গণহত্যার ঘটনাও এভাবে ধামাচাপা দিয়ে শান্তিবাহিনীর ঘাড়ে চাপানোর কম চেষ্টা করা হয়নি। এ উদ্দেশ্যে ঘটনার পরপরই স্থানীয় সেনা ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের দ্বারা 'শান্তিবাহিনী হামলায় ১১ জন নিহত ও কয়েকশত ঘরবাড়ী ভস্মীভূত' হওয়ার সংবাদ জাতীয় সংবাদপত্র ও বিদেশী বেতার মাধ্যমসমূহকে সরবরাহ করা হয়। সুতরাং

সশস্ত্র বাহিনী, অনুপ্রবেশকারী ও স্থানীয় বেসামরিক কর্মকর্তা-দের সাক্ষ্য কতটুকু বস্তুনিষ্ঠ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। অথচ ঐ শ্রেণী সাক্ষীদের সাক্ষ্য অমোঘ সত্য বিবেচনা করে তিনি "যে পাহাড়ের উপর চাকমা গ্রামটি অবস্থিত সেই পাহাড়ের পেছনে সশস্ত্র বিদ্রোহীরা লুকিয়ে ছিল" বলে শান্তিবাহিনীর উপস্থিতিকে সমর্থন করে গেছেন। অপরদিকে ঐ শ্রেণীর সাক্ষী-দের বক্তব্য যেভাবে তুলে ধরে তিনি যৌক্তিকতা টেনেছেন, তুল-নায় লোগাং গুচ্ছগ্রামবাসী ও প্রত্যক্ষ শিকার ১৬ হতে ৪২ নং সাক্ষীদের সাক্ষ্যর কোন গুরুত্ব দেননি। অথচ "শান্তিবাহিনী অথবা কোন দুষ্কৃতকারী যে আগ্নেয়াস্ত্রসহ ঘটনাস্থলে এসেছিল এবং বাঙ্গালী অথবা চাকমা গ্রাম আক্রমণ করেছিল সেই কথা তারা উল্লেখ করতে অস্বীকার বা গ্রহণ করেনি" (পৃঃ ৮) বলে তাঁর রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেছেন। এমনকি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ও দায়ী ৫৭ নং স্বাক্ষী হাবিলদার নুরুল ইসলামসহ পানছড়ি থানার এ এস আই, ও সি প্রমুখ সাক্ষীরা "শান্তিবাহিনীরা যেখান থেকে গুলি ছুঁড়েছিল বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল সেখানে কোন আলামত বা কার্তুজের গোলা পাওয়া যায়নি" (পৃঃ ১২) বলেও সাক্ষ্য দেয়। তবুও ঘটনার সময়ে শান্তিবাহিনীদের উপস্থিতি ও শান্তিবাহিনীর ঘটনার সূত্রপাতের জন্য দায়ী বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রামাণিক তথ্য ছাড়াই কেবল একপক্ষের মুখের কথায় কোন কিছুর চূড়ান্ত রায় দেয়া একজন বিজ্ঞ বিচার-পতিজনিত ন্যায়পরায়ণতা হতে পারে না।

ভি ডি পি, আনসার ও বি ডি আরদের গুলিবর্ষণের বৈধতা দানের জন্য "সশস্ত্র বিদ্রোহী" বলে যেমন উল্লেখ করে-ছেন, পাশাপাশি আবার ১ হতে ৮নং সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী "দাও দিয়ে গলা কেটে কবির আহম্মদের হত্যাকে" যথার্থ প্রমাণের জন্য "বিদ্রোহীরা আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত ছিল না।" (পৃঃ ২০) বলেও উল্লেখ করেছেন। পক্ষপাতমূলক একচোখা মূল্যায়ন না হলে এমনটি স্ববিরোধী প্রলাপ তিনি নিশ্চয় করতেন না। শান্তিবাহিনীরা সশস্ত্র গ্রুপ সুতরাং তারা আক্রমণ করলে কবির আহম্মদের সঙ্গীরা পালিয়ে যাওয়ার সময় গুলি করে অনায়াসে ধরাশায়ী করতো এবং কবির আহম্মদকে গুলির পরিবর্তে দাও দিয়ে হত্যা করার প্রয়োজন হতো না।

সুতরাং ঘটনাস্থলে কোন আলামত না পাওয়া, প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের অস্বীকৃতি, বিচারপতি সাহেবের মনগড়া স্ববিরোধী যুক্তি উপস্থাপন ইত্যাদি প্রমাণ করে যে এ ঘটনায় শান্তিবাহিনীরা মোটেও জড়িত নয় এবং কবির আহম্মদও শান্তিবাহিনীদের দ্বারা নিহত হয়নি।

বিচারপতি খানের চিহ্নিত কারণসহ গণত্যার সূত্রপাতের আরো দু'টো কারণ দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। একটি হলো—নিহত কবির আহম্মদদের একটু মস্তিষ্ক বিকৃতি ছিল। সঙ্গীদের সাথে মার্বেল খেলার সময় ঝগড়া হলে কবির আহম্মদ অপর দুই সঙ্গীকে দাও দিয়ে আঘাত করে, সঙ্গীদ্বয়ও উত্তেজিত হয়ে তাকে দাও দিয়ে আঘাত করে এবং এতে সে নিহত হয়। ঐ দু'জন সঙ্গী নিজেদের দোষ ধামাচাপা দেওয়ার জন্য দৌড়ে গিয়ে শান্তিবাহিনীরা আক্রমণ করেছে বলে প্রচার করে। অনুপ্রবেশকারী নিজে-দের মধ্যকার ঝগড়া বিবাদ ও অপরাধ ঢাকার জন্য এভাবে শান্তিবাহিনী বা জুম্মদের উপর দোষ চাপানোর অপচেষ্টা আগেও অসংখ্যবার লক্ষ্য করা গেছে। অথচ বিচারপতি খান এসব বিন্দু বিসর্গও বিবেচনায় আনেননি।

অপর কারণটি হলো—কবির আহম্মদ তার সঙ্গীসহ পলোগাং গুচ্ছগ্রামের বাসিন্দা গীতা চাকমা নাম্নী জুম্ম রমণীকে কাঠ সংগ্রহের সময় ধর্ষণের চেষ্টা করলে গীতা চিৎকার করতে থাকে। তার স্বামী পাশের জঙ্গল হ'তে গীতাকে উদ্ধার করতে আসে এবং কবির আহম্মদকে কুপিয়ে হত্যা করে ও অন্য দু'জনকে আহত করে। সেও ঘটনায় নিহত হয়। এতে ঘটনাস্থলে ঐ কবির আহম্মদ নিহত হয় এবং অন্য সঙ্গীরা আহত অবস্থায় দৌড়ে গিয়ে শান্তিবাহিনীরা আক্রমণ করেছে বলে মিথ্যা প্রচার চালায়। ৬২ নং ও ৬৪ নং সাক্ষী মিন্টো বিকাশ চাকমা ও জগদীশ চন্দ্র চাকমা দু'জনেই "নিহত কবির আহম্মদ কর্তৃক একজন চাকমা মহিলাকে আক্রমণ করার প্রচে-ষ্টায় স্থানীয় শালিশকারী অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান যে শাস্তির ব্যবস্থা করে, তাতে এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়" (পৃঃ ৬) বলে সাক্ষ্য দিয়েছে, যা ঐ ঘটনাটির সত্যতা প্রমাণ করে।

জানা গেছে ঐ গীতা চাকমা প্রাণের ভয়ে ঘটনার পর পরই ত্রিপুরা রাজ্যের শরণার্থী শিবিরে চলে গেছে। সেখানে সাংবাদিকরা তার সাক্ষাৎকারও নিয়েছে বলে সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা গেছে। অথচ বিচারপতি খান ঐ গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর সাক্ষ্য নেয়ার ন্যূনতম চেষ্টাও করেননি। সুতরাং তার চিহ্নিত ঘটনার সূত্রপাতের কারণ কখনো সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ হতে পারে না।

তিন

নিহত সংখ্যার ব্যাপারে তিনি উল্লেখ করেছেন—"এই সমস্ত প্রমাণ ও অবস্থার আলোকে আমি নিশ্চিত হই যে,

উপজাতীয়দের মৃতের সংখ্যা ১২ এর বেশী হবে না" (পৃঃ ১৯)। নিহতের সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সরকারী তালিকা, ছাত্র পরিষদের তালিকা, জন সংহতি সমিতির তালিকা, প্রত্যক্ষদর্শী ও ঘটনার শিকার ব্যক্তিবর্গের সাক্ষ্য এবং সর্বোপরি লোগাং গুচ্ছ-গ্রামের রেশন তালিকা প্রভৃতি সূত্র রয়েছে।

রিপোর্টে দেখা গেছে, তিনি কেবল সরকারী তালিকা/বক্তব্যকেই তলিয়ে দেখেছেন। খাগড়াছড়ি ব্রিগেড কমান্ডার, পানছড়ি এ এস আই, ও সি, টি, এন, ও ও মেডিকেল অফিসার, স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, অনুপ্রবেশ কারী প্রমুখ সাক্ষীদের সাক্ষ্যকে তুলনামূলকভাবে যে অভ্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, অথচ তারা সকলেই সরকারের লোক। সুতরাং এটা সরকারের লোকদের কাছ থেকেই সরকারের বক্তব্যকে যাচাই করার সামিল। বিচারপতি খানের অবিদিত থাকার কথা নয় যে, বাংলাদেশের শাসনামলে ঐ সেনাবাহিনী, স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসন ও অনুপ্রবেশকারীরাই আজ অবধি ধারাবাহিকভাবে পর পর ডজন খানেকের অধিক জুম্ম গণহত্যা চালিয়ে এসেছে। লোগাং গণহত্যাও এর বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং বিচারপতি খানের তদন্ত / বিচার কার্য চোরকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করিয়ে চোরের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করার একটি ভেলকিবাজী বৈ কিছুই নয়। যেমন বৈ-সা-বি আমন্ত্রণে ঢাকা থেকে আসা ২৩ জন বুদ্ধিজীবীর মধ্যে শিশির মোড়ল, সারা হোসেন, মোস্তফা কামাল ও রোজা-লিন কোস্টা জুম্মদের সাক্ষ্য খণ্ডন করেছেন এভাবে—"তাহারা যখন ব্রিগেডিয়ার শরীফ আজিজের সঙ্গে খাগড়াছড়িতে দেখা করেন তিনি তাদেরকে মৃতের সংখ্যা ১৩৮ বলেছেন। আমি ব্রিগেডিয়ার শরীফ আজিজকে জিজ্ঞাসা করি...এই সাক্ষী-দেরকে অনুরূপ বলেছেন বলে তিনি অস্বীকার করেন" (পৃঃ ৯)।

অনুরূপভাবে খণ্ডন করেছেন প্রত্যক্ষদর্শী চন্দ্র সাগর চাকমার সাক্ষ্য—"৭১ নং সাক্ষী চন্দ্র সাগর চাকমা যে ১৫০টি মৃতদেহ দেখেছে বলে অভিযোগ করেছিল, কিন্তু পরদিন রিজিয়ন কম্যান্ডার ব্রিগেডিয়ার শরীফ আজিজ যখন ঘটনাস্থলে আসেন তখন আশ্চার্যজনকভাবে সে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ১১ জন চাকমার মৃতদেহ দাবী করেছিল" (পৃঃ ১৮-১৯)।

অপরদিকে ছাত্র পরিষদের তালিকাভুক্ত নিহত ১৩৮ জন সম্পর্কে বলেছেন "স্থানীয় প্রশাসন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সাময়িকী রাঙ্গাবে যাদের মৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছিল তাদের কয়েকজনের জীবিত থাকার রেকর্ড উপস্থাপন ও সেইরূপ ২২ জনকে হাজির করে" (পৃঃ ১৮)।

একজন বিচারপতি হিসেবে সশরীরে উপস্থিতির প্রমাণ ব্যতীত কেবলমাত্র প্রশাসনের প্রদর্শিত মামুলী দলিলপত্রের উপর নির্ভর করে কিভাবে তিনি নিশ্চিত হলেন যে ২২ জন ছাড়াও অবশিষ্ট লোকেরা জীবিত। অথচ লোগাং গুচ্ছগ্রাম থেকে উক্ত ১৩৮ জনকে সরেজমিনে ও সশরীরে প্রমাণ করা তাঁর পক্ষে এমন কোন কঠিন কাজ নয়। এ থেকে এটাই ধারণা করা যেতে পারে যে, তিনি পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রণীত তালিকার মধ্যে কেবল ২২ জন ব্যতীত অবশিষ্ট লোকগুলিকে সরাসরি জীবিত প্রমাণ করতে পারেননি এবং ঐ লোকগুলি প্রকৃত পক্ষেই মৃত।

অপরদিকে গুচ্ছগ্রামের রেশন তালিকা, জন সংহতি সমিতি কর্তৃক প্রচারিত পুস্তিকায় নিহত ২৭ জনের তালিকা এবং সর্বোপরি ত্রিপুরা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়া ঘটনার সবচেয়ে প্রত্যক্ষ শিকার জুম্মদের সাক্ষ্য তিনি তলিয়ে দেখেননি। ত্রিপুরায় আশ্রিত হাজারোধিক লোগাং গুচ্ছগ্রামবাসীর হিসেব বিচারপতি খান কিভাবে মিলিয়েছেন একমাত্র তিনিই জানেন। তারা ত্রিপুরায় চলে গেছে নাকি নিহত হয়েছে বা নিখোঁজ রয়েছে এমন কোন কিছুই তার তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ নেই। ত্রিপুরায় আশ্রিত সুখমনি চাকমা, লাল্যা চাকমা, সুনয়ন চাকমা, ভুষ্ঠমনি চাকমা প্রমুখ লাশ বহনকারীরা ১৫০ হ'তে ২০০ এর অধিক লাশ গুনেছে বলে জানিয়েছে (সূত্র: জুম্ম সংবাদ বুলেটিন নং-৭১)। অনুরূপভাবে গণহত্যার পূর্ব রাত্রে ত্রিপুরা শরণার্থী শিবির থেকে প্রত্যাগত ৪২ জন জুম্মকে সেদিন যে গোলঘরে রাখা হয়েছিল গণহত্যার পর তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। সুতরাং নিহতদের সংখ্যা ১২ হ'তে বেশী হবে এটা নিশ্চিত।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে তিনি কেবলমাত্র কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য নিতেই ৪৫ জন নিহত ব্যক্তির হদিস পেয়েছেন। অনুরূপভাবে, পানছড়ি মেডিকেল অফিসারকে চিকিৎসার জন্য ঘটনাস্থলে ডাকা হলে অসংখ্য লাশ দেখে তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। এখন অবশ্য কেহ ঐসব কথা স্বীকার করবেন না, যেমনটি ১৩৮ জনের মৃত্যু সম্পর্কে নিজ স্বীকারোক্তি পরে অস্বীকার করেন ব্রিগেডিয়ার শরীফ আজিজ।

তাঁর রিপোর্টে উল্লেখিত—"এরূপ বিপুল সংখ্যক মৃতদেহকে স্থানান্তর করা অথবা সরানো অথবা কোন জায়গায় লুকানো অসম্ভব। কারণ এরূপ বিপুল সংখ্যক মৃতদেহকে যানবাহন ছাড়া সরানো

যায়না এবং সেগুলিকে রাস্তার পার্শ্বে বিন্যস্ত করতে হবে এবং এরূপ মৃতদেহের বিন্যাসকে গোপন করা যায় না" (পৃঃ ১৯)। অকাট্য যুক্তি বটে। খাগড়াছড়ি যেন সেনাবাহিনীর জীপ, পিক-আপ, লরি ও অন্য কোন যানবাহনবিহীন মধ্যযুগীয় একটি অঞ্চল। ঐভাবে যে সরানো হয়নি তিনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন?

রিপোর্টে যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন···"তারা (বে-সা-বি আমন্ত্রণে আসা ২৩ জন বুদ্ধিজীবীর দল) নিরাপত্তাজনিত কারণে স্থানীয় সামরিক অফিসাররা তাদেরকে লোগাং এর দিকে যেতে বাধা প্রদান করে" (পৃঃ ৯) এবং "১১ই এপ্রিল বৈশিষ্ট্য মনি লোগাং গ্রামে গিয়েছিল ও অন্যান্য মৃতদেহের সাথে তার স্ত্রীর মৃতদেহ দেখেছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাকে মৃতদেহটি ফেরত দিতে অস্বীকার করে" (পৃঃ ৯)। এসব বাধানিষেধ লাশ গুম করারই সাক্ষ্য বহন করে নিঃসন্দেহে। অন্যথায় ঐদিন গণধিকৃত জেলা পরিষদের সাঙ্গপাঙ্গদের লোগাঙে যেতে দেওয়া হয়েছে অথচ ঐ বুদ্ধিজীবী দলকে যেতে না দেয়া বা বৈশিষ্ট্য মনিকে স্ত্রীর লাশ না দেয়ার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। যেখানে মুক্তি যুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক হত্যাকৃত হাজার হাজার লোকের লাশ বা গণকবর এখনো অনাবিষ্কৃত, সেখানে লাশ গুম করা অসম্ভব বলে বিচারপতি খান আজগুবি প্রলাপ বকেন কিভাবে?

চার

বিচারপতি খান তাঁর তদন্তে ১০১ জনের সাক্ষ্য নিয়েছেন। এসব সাক্ষীর মধ্যে রয়েছে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, অনুপ্রবেশকারী, বেসামরিক প্রশাসনের লোক, তুলা গোষ্ঠীর লোক, প্রত্যক্ষদর্শী ও গণহত্যার শিকার, বাঙালী বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক দলের লোক এবং অন্যান্য জুম্ম। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনাবলীর সাথে এসব লোকের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সশস্ত্র বাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসনের লোকজন সরকারেরই লোক এবং অনুপ্রবেশকারীরা সরকারের পোষ্য। এই তিন শ্রেণীর লোকদের মাধ্যমে সরকার এ যাবৎ তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও কার্যকরী করে আসছে। এযাবৎ সংঘটিত জঘন্য খানেক গণহত্যা এ শ্রেণীর লোকরাই সংঘটিত করে আসছে এবং অনুরূপভাবে লোগাং গণহত্যায়ও ঐ শ্রেণীর লোকদের প্রত্যক্ষ হাত রয়েছে। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, নিজেদের অপকীর্তি ও ব্যর্থতা ধামাচাপা দেয়ার জন্য এ জাতীয় লোকরা অবিশ্বাস্য রকমের কারসাজিতে পারদর্শী। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য কখনোই বস্তুনিষ্ঠ হতে পারে না ও তাদের বক্তব্য মানেই সরকারের বক্তব্য। যারা নিজেরাই গণহত্যা লোগাং সংঘটিত করেছে তাদের সাক্ষ্যকে বিচারপতি খান কোন্ যুক্তিতে বিশ্বাস করলেন তা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক বটে!

অনুরূপভাবে তুলা গোষ্ঠীর লোকরা সরকারের হালুয়া-রুটির লোভে সব সময়ই সরকারের শেখানো বুলি আওড়াতে সদা আত্মনিবেদিত এটা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য বিবেচনার অযোগ্য। রাজনৈতিক দলের লোকজনের মধ্যে অনেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনাবলীকে দলের মতাদর্শ-এর চেয়ে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে বেশী উৎসাহী। সম্প্রতি দিঘীনালায় রাজনৈতিক দলের লোকজন দ্বারা সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই এর সত্যতা প্রমাণ করে।

এখানে প্রত্যক্ষদর্শী ও ঘটনার শিকার, বাঙালী বুদ্ধিজীবী, অন্যান্য জুম্মদের সাক্ষ্য সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য। এদের সাক্ষ্য বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার সবচেয়ে সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষতঃ প্রত্যক্ষদর্শী ও ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের সাক্ষ্য। এসব প্রত্যক্ষদর্শী ও শিকার গুচ্ছগ্রামবাসীদের মধ্যে এক অংশ ঘটনার পর পরই স্রেফ জীবন বাঁচানোর তাগিদে ত্রিপুরা রাজ্যে চলে গেছে আর এক অংশ সেনাবাহিনীর সতর্ক প্রহরা ভেদ করে পালিয়ে যেতে পারেনি। অথচ তিনি কেবল শেষোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য নিয়েছেন।

যেখানে সত্য কথা বলতে গিয়ে প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হতে হয়, যেখানে লাইফ ইজ নট আওয়ারস এরূপ ভীতিকর পরিবেশে উদ্বেগের মধ্যে জুম্ম জনগণ প্রতিক্ষণ কাটাতে বাধ্য হয়, সেনাবাহিনীর খড়্গ উত্তোলিত সেরূপ পরিবেশে ঐসব প্রত্যক্ষদর্শী ও ঘটনার শিকার ব্যক্তিরা মন খুলে কতটুকু বস্তুনিষ্ঠ ও মনের অব্যক্ত বেদনার করুণ কথা বলতে পারবেন তা সহজেই অনুমেয়। ব্রিটিশ লর্ড হাউজের প্রভাশালী সদস্য ও ব্রিটিশ সরকারের পার্লামেন্টারী হিউম্যান রাইটস্ কমিশনের চেয়ারম্যান লর্ড এভেবারী কর্তৃক ব্রিটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ রাষ্ট্রমন্ত্রী ট্রিসটেন গ্যাভেল জোনসকে ২৬শে সেপ্টেম্বর '৯২-এ লেখা দলিল থেকে এ সম্পর্কে আরো পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। লর্ড এভেবারী লিখেছেন—"আমি অবহিত হই যে, অধিকাংশ সাক্ষীগণ সরকারের সমর্থক। নিঃসন্দেহে আমি বলতে পারি যে, প্রত্যক্ষদর্শী জুম্মরা ভয়ে সাক্ষ্য দিতে আসবে না এবং কার্যকর সাক্ষীদের যে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে তা আমি বিশ্বাস করি না। এই সব সাক্ষীদের নাম সশস্ত্র বাহিনীর গোচরে যাবে তাদের প্রমাণাদি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে হলে এ ক্ষেত্রে তাদের প্রতিশোধের শিকার হওয়ার ভয়ের কারণ রয়েছে"। তদন্ত রিপোর্টের উপর এশিয়াওয়াচ কর্তৃক মূল্যায়নকৃত দলিলেও তার পরিষ্কার ধারণা দেয়া আছে—"খাগড়াছড়িতে সাক্ষাৎকার

অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোন কিছু বলা হয়নি, কেবলমাত্র বলা হয় যে, তাদেরকে মার্কিট হাউজের একতলায় আর্মিদের ব্রিফিং নিয়ে দ্বিতলে নেয়া হয়েছিল। কয়েকজন চাকমা নেতা অভিযোগ করেন যে, পরিবারের সদস্য হারিয়েছেন এমন সাক্ষীগণ ভয়ে তা উল্লেখ করতে পারেননি।"

অথচ সেনাবাহিনীর নির্যাতনের আশংকা মুক্ত হয়ে বলতে পারতেন ত্রিপুরায় আশ্রিত প্রত্যক্ষদর্শীরা, তাদের সাক্ষ্য তিনি নেননি। তাদের মধ্যে ছিল আহত, লাশ বহনকারী, নিহতদের আত্মীয়-স্বজন, ঘটনা সূত্রপাতের অন্যতম সাক্ষী গীতা চাকমা, এমনকি সরকারের দালাল হয়েও সরকারের তাণ্ডবতা দেখে হতবিহ্বল তথাকথিত গণপ্রতিরোধ কমিটির (গপ্রক) সদস্যও।

অপরদিকে, তাঁর ভাষ্য মতে ঘটনা সূত্রপাতের অন্যতম দায়ভাগী শান্তিবাহিনীর সাথেও তিনি কোন কথা না বলে একতরফাভাবে তাদের উপর খড়্গহস্ত হয়েছিলেন। তাই বি বি সি সাউথ এশিয়া সার্ভের এক সাক্ষাৎকারে উক্ত বিষয়ে প্রশ্নের মুখোমুখী হলে তিনি বেশ খেয়ালী স্বরে হেসে যে উত্তর দিয়েছিলেন তার বাংলা সারমর্ম দাঁড়ায় —তাঁরা তো ভারতেই থাকে। সুতরাং তাদের সাথে যোগাযোগ ও কথা বলার সুযোগ কোথায়? তাঁর এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতের তথা থিত হস্তক্ষেপের জিগির তুলে বিশ্বের জনমতকে অন্যদিকে প্রবাহিত করার এটা একটা হীন অপচেষ্টা ছাড়া আর অন্য কিছু হতে পারে না। অন্য সব কিছুর উপায় বাদ দিলেও অন্ততঃ জন সংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যকার যোগাযোগ রক্ষাকারী উভয় পক্ষের স্বীকৃত যে পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটি রয়েছে, তার মাধ্যমে অনায়াসে যোগাযোগ করতে পারতেন। জন সংহতি সমিতি অন্ততঃ তা সাদরে গ্রহণ করত। কিন্তু তিনি কোনটাই করেননি। এ থেকে তাঁর সাক্ষী বাছাইকরণ, ১০১ জন সাক্ষীর নেয়া সাক্ষ্য কতটুকু নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ হতে পারে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

পাঁচ

ঘটনা প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে বিচারপতি খান অঞ্চলের ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা বিবর্জিত কয়েকটি সুপারিশও করেছেন। তন্মধ্যে ভূমি জরিপ ও সেনা মোতায়েন অন্যতম। ভূমি জরিপ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন— "ভূমির মালিক অথবা দাবীদারদের স্বত্ব এবং দখলের দলিলাদি তৈরীর জন্য অনতিবিলম্বে ভূমি জরিপের ইহাই উপযুক্ত সময়। যদি ভূমি জরিপ করা হয় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার উত্তেজনা ও শত্রুতার বাস্তব কারণ প্রশমিত হবে" (পৃঃ ২১)।

জুম্ম ও বাঙালীদের মধ্যকার বিরোধের ক্ষেত্রে ভূমি দখল বা বেদখল একটি অন্যতম কারণ হলেও সমাধানের প্রধান দিক নয়। প্রকৃত ও প্রধান দিক হলো রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। প্রকৃত পন্থায় সমাধান ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় এর সমাধান আসতে পারে না। বরং সমস্যা আরো জটিলতর হতে বাধ্য। বিচারপতি খানের ভূমি জরিপ সুপারিশও ঐরূপ একটি উদ্ভট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত সুপারিশ।

জুম্ম সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে ভূমির সমষ্টিগত মালিকানা প্রচলিত। জুম্ম ও বাগান চাষের পাহাড়সহ বাস্তভিটার ভূমি পরস্পর সুবিধামতো ব্যবহার করার ঐতিহ্য প্রচলিত থাকার কারণে এসব ভূমি প্রায় সকলেরই, কেবল দখলীস্বত্বের আওতায় ভূমি মালিকানা স্বীকৃত হয়ে আসছে। তাই ভূমি জরিপ হলে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র প্রদর্শন জুম্মদের পক্ষে অসম্ভব। এছাড়া যা বন্দোবস্তি রয়েছে সেসব দলিলপত্রও সহিংস পরিস্থিতির কারণে, উদ্বাস্তু হয়ে অনেকের হারিয়ে গেছে। অপরদিকে পঞ্চান্ন হাজারোধিক জুম্ম এখনো ত্রিপুরা রাজ্যে রয়ে গেছে।

ভূমি জরিপ নিঃসন্দেহে প্রয়োজন। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার প্রকৃত সমাধানের পূর্বে তা কখনো সফল হতে পারে না। কেননা কেবল স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই ভূমি জরিপ পরিচালিত হয়ে থাকে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন এরূপ পরিবেশ অনুপস্থিত। সুতরাং এ মুহূর্তে ভূমি জরিপ হলে জুম্মদের দখলীকৃত অধিকাংশ ভূমি হাতছাড়া হবে ও খাসভূমিতে পরিণত হবে। স্বাভাবিকভাবে এসব খাস ভূমিতে অনুপ্রবেশকারীদের বন্দোবস্তি দেয়ার সুযোগ ঘটবে। ফলে জুম্ম ও বাঙালীদের মধ্যকার বিরোধ ও শত্রুতা দূরীভূত না হয়ে অধিকতর জটিল হবে। বস্তুতঃ অনুপ্রবেশকারীদের ভূমি বন্দোবস্তি দেয়া ও জুম্মদেরকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যেই বিচারপতি খান এই সুচতুর জঘন্য সুপারিশ করেছে এটা নিঃসন্দেহে বলা যাবে।

অনুরূপভাবে সেনা মোতায়েন সংক্রান্ত তাঁর অপর সুপারিশও জঘন্য এবং ইতিমধ্যেই তা অকার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। ঐ সুপারিশে তিনি বলেছেন যে, "আমি নথিতে উল্লেখ করতে চাই, শান্তিবাহিনীর বিদ্রোহ যতদিন চলবে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি ততদিন প্রয়োজন হবে। প্রতিরক্ষার জন্য গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে অস্ত্র ও ট্রেনিং প্রদানের..." (পৃঃ ২৪) পরামর্শও দিয়েছেন। একটি

রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের সুপারিশ না করে তিনি সামরিক উপায়ে সমাধানের কথা বলেছেন। তাঁর জানা থাকারই কথা যে—সুদীর্ঘ দু'দশক ধরে সামরিক উপায়ে সমাধানের ব্যর্থ চেষ্টা করেও আজ অবধি কোন সরকারই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধান করতে পারেনি। অধিকন্তু সামরিক সন্ত্রাস, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, ধর্মীয় পরিহানি হত্যাযজ্ঞ প্রভৃতি মানবাধিকার বিরুদ্ধ কাজ ঐ সেনাবাহিনী দ্বারা সংঘটিত হয়ে সমস্যাকে আরো জটিলতর করেছে। আর ভিডিপি সদস্যরাইতো ঐরূপ ধ্বংসাত্মক কাজে সবসময়ই অগ্রগামী। লোগাং গণহত্যায়ও "প্রত্যেক আনসার এবং ভি ডি পি সদস্যদেরকে ৩০৩ রাইফেলস ও ২০ রাউণ্ড গুলি এবং বি ডি আরদেরকে গুলিসহ স্বয়ংক্রিয় ও আধাস্বয়ংক্রিয় অস্ত্র সরবরাহ" (পৃঃ ২) ১ (হ'তে ৮নং সাক্ষ্য মতে) এর মাধ্যমে ঐরূপ সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা জুম্মদেরকে হত্যা করেছিল।

সুতরাং জুম্মদের লোগাং গণহত্যার ন্যায় গিনিপিগের মতো ধরে ধরে হত্যা করার জন্যই কি বিচারপতি খানের 'সেনা মোতায়েন' সুপারিশ? রিপোর্টের ভাষা ও বক্তব্য দেখে স্পষ্টতঃ তারই ধারণা জন্মে। জিয়া, এরশাদ ও খালেদার মতো তিনিও "সশস্ত্র বাহিনী বীরোচিত কাজ করেছে" (পৃঃ ২২) বলে সশস্ত্র বাহিনীর ঐ কাজকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন। এমনকি তিনি "কতিপয় দেশে বিচার বহির্ভূত যেভাবে প্রাণবধ করা হয় সেইরূপ কোন প্রাণবধ করা হয়নি" (পৃঃ ২৩) এই বক্তব্য রাখতেও তাঁর বিবেকে বাঁধা দেয়নি। যেখানে প্রতিনিয়ত বিনাবিচারে প্রাণবধ চলছে সেখানে ন্যায় ও মানবতার রক্ষক হিসেবে একজন বিচারপতি থেকে এমনতর বক্তব্য আশা করা যায় না।

সুতরাং বিচারপতি খানের সুপারিশসমূহ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবতা বিবর্জিত, কাণ্ডজ্ঞানহীন এবং ন্যায়নীতিবাদী চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

লোগাং গণহত্যা কোন স্থানীয় বা বিচ্ছিন্ন কিংবা আকস্মিক ঘটনা নয়। সুতরাং বিচ্ছিন্ন ও একরঙাভাবে বিচার করলে এই গণহত্যার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত যেমন আশা করা যায় না, তেমনি ঐ জাতীয় সমস্যারও প্রকৃত সমাধান আসতে পারে না। লোগাং গণহত্যার মতো হত্যাযজ্ঞ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যারই একটি অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার গভীরে এ জাতীয় হৃদয় বিদারক ঘটনার চূড়ান্ত সমাধান প্রোথিত। তাঁর উর্বর মস্তিষ্কে তিনি যেমন খুঁজে পেয়েছেন "শান্তি বাহিনীর বিদ্রোহ তখনই সমাধান হবে যদি বাংলাদেশের মঙ্গলার্থে ভারত শান্তিবাহিনীর রিক্রুইমেন্ট, প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহে অনীহা প্রকাশ করে" (পৃঃ ২৩) এমনতর উদ্দেশপ্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা যেমন সমস্যার প্রকৃত সমাধান আসতে পারে না, তেমনি প্রমাণছাড়া এরূপ বক্তব্য রাখাও একজন বিচারপতি হিসেবে অত্যন্ত বেমানান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম দশ ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণেরই শাশ্বত আবাসভূমি। সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, দৈহিক ও মানসিক গড়ন, ভৌগোলিক পরিবেশ, জাতীয় শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক জীবনধারা প্রভৃতির ক্ষেত্রে জুম্ম জনগণ বাংলাদেশের অপরাপর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান বাঙালী জনগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। অধিকতর অগ্রসর সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর আগ্রাসনে অধিকতর পশ্চাদপদ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সত্তার ও আবাসভূমি লুপ্ত হতে বাধ্য। এই মর্মকথা অনুধাবন করে ব্রিটিশ সরকার ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি প্রবর্তন করে। উক্ত শাসনবিধি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত নিষিদ্ধ। জুম্ম জনগণের ঐ মর্মকথাকে অস্বীকার করে পাকিস্তানের ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সংবিধানেও প্রকাশ্যভাবে ঐ অধিকারকে খর্ব করে দেয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী ঐ আইনকে লংঘন করে জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার এক হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। লক্ষ লক্ষ মুসলমান বাঙালী পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ ঘটাতে থাকে এবং গণহত্যা, ভূমি বেদখল, সামরিক সন্ত্রাস, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ প্রভৃতি হীন কার্যকলাপের মাধ্যমে জুম্ম নিশ্চিহ্নকরণ ধারাবাহিক অভিযান কার্যকরী হতে থাকে। মোদ্দা কথা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর নীতি হলো,—আমরা ভূমি চাই মানুষ চাই না। লোগাং গণহত্যা ঐ ধারাবাহিক অভিযানেরই এক সফল বাস্তবায়ন। সুতরাং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই লোগাং গণহত্যার যত ঘটনার প্রতিরোধের উপায় বা স্থায়ী সমাধান খুঁজতে হবে। ভারতের সদিচ্ছা বা সেনা মোতায়েন ও ভূমি জরিপ করে নয়, জুম্ম জনগণের ন্যায্য ও শাশ্বত অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রশাসনের মাধ্যমেই এ ধরণের ঘটনার কেবল প্রকৃত সমাধান অর্জিত হতে পারে।

ছয়

তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে যতটুকু না বিচারকের ন্যায়-পরায়ণতা, সততা ও মহত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচারপতি খান নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন, ততোধিক হয়েছেন বর্ণবাদী ও

সম্প্রদায়বাদী আবেগপ্রবণতা দ্বারা ঐ দৃষ্টিভঙ্গিতে এতই আবেগ-প্রবণ হয়েছেন যে তিনি "বাঙালী সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রোহীদের নিষ্ঠুরতা কারণ" (পৃঃ ২১) এর রাজনৈতিকভাবে ব্যাখ্যার কোন সুস্থ ও ধীর মস্তিষ্কের অবকাশ রাখতে পারেননি। এমনকি "১৯৮০—'৯১ পর্যন্ত শান্তিবাহিনীর আক্রমণে ৯৫২ নিহত, ৬৫২ আহত ও ৪১১ জন বাঙালী অপহরণ" (পৃষ্ঠাঃ ২১) এই একতরফা তথ্য দিতেও তাঁর চোখের পর্দায় আটকায়নি।

অথচ জুম্ম নিশ্চিহ্নকরণ অভিযানের অধীনে ধারাবাহিক-ভাবে বেসামরিক প্রশাসনের যোগসাজশে সেনাবাহিনী ও অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যায় নিহত জুম্মদের তথ্য যেমন—১৯৭১ সনে দিঘীনালায় ১৩ জন ও পানছড়িতে ৪৭ জন, ১৯৮০ সনে কলমপতিতে প্রায় ৩০০ জন, ১৯৮১ সনে মাটিরাঙ্গা-বেলছড়িতে প্রায় ৩০০ জন, ১৯৮৪ সনে ভূষণছড়ায় ৬২ জন, ১৯৮৬ সনে পানছড়ি-মাটিরাঙ্গা-খাগড়াছড়িতে ৫০ জন, একই বছরে রামবাবু ঢেবায় ৪২ জন ও চংড়াছড়িতে ১৮ জন, ১৯৮৮ সনে বাঘাইছড়িতে ৩৬ জন, ১৯৮৯ সনে লংগদুতে ৩২ জন, ১৯৯২ সনে মাল্যায় ১৪ জন প্রভৃতি উলঙ্গ ও লজ্জাজনক-ভাবে তিনি এড়িয়ে গেছেন।

অনুপ্রবেশকারীরা, যারা জুম্মদের ভূমি বেদখল করছে, জুম্মদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, অসহায় জুম্ম মা-বোনদের ইজ্জত লুট করছে তারা শান্তিবাহিনীর হামলার শিকার হলে তিনি রাজনৈতিকভাবে ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা খুঁজে পান না। তাঁর উপর এমনটি করা হলে তিনি কি এসব বরদাস্ত করতেন? পাক হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ কি বরদাস্ত করেছেন? ঐসব বসতিকারী মুসলমানদেরকে ১৯০০ সালের শাসনবিধি উপেক্ষা করে বে-আইনীভাবে বসতি দেয়া হয়েছে। সমতলভূমির জেলাগুলিতে সংখ্যালঘু জুম্মরা বসতি স্থাপন করলে সংখ্যাগুরু মুসলমান বাঙ্গালীদের জাতীয় ও জুম্মভূমির অস্তিত্বের হুমকি দেখা দেবে না। পক্ষান্তরে জুম্মদের দেখা দেবে, দেখা দিয়েছেও। এসব যৌক্তিক বিষয়কে উপেক্ষা করে তাঁর "বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সমতল জেলার শহরে বসতি স্থাপন ও সম্পত্তির অধিকারী হওয়া অন্যান্য উপজাতীয়দের ন্যায় তাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন" (পৃঃ ২১) মন্তব্য জুম্ম জনগণের দাবীনামা ও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি উপেক্ষা করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে প্রণীত ঐতিহাসিক বাস্তবতা বিবর্জিত আইনের ধোঁয়া তোলা সাম্প্রদায়িক ও জুম্ম বিদ্বেষপ্রসূত না হয়ে পারে না।

জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ ছড়াতে তিনি যেমন সকল প্রকার নীতিবোধকে বিসর্জন দিয়ে মনগড়াভাবে লোগাং গণহত্যাকে "বিদ্রোহীদের পরিকল্পিত লক্ষ্যে সংঘটিত" বলে গালমন্দ করতে ছাড়েননি, তেমনি "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান উপজাতি চাকমারা ২০০ বৎসরের কিছু আগে আরাকান থেকে আগত ও প্রধানত রাঙ্গামাটি এলাকায় বসতি স্থাপন সম্পর্কে" (পৃঃ ১৪) এই বক্তব্য রেখে চাকমা তথা জুম্মদের বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত করে জুম্ম উচ্ছেদকরণকে মদত যোগাতেও কার্পণ্য করেননি। জুম্ম বিরোধী বক্তব্যকে অধিকতর জোরালো করতে তিনি "ভারতে শান্তিবাহিনীর রিক্রুইট, ট্রেনিং এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিযান চালানোর জন্য উপজাতীয়দের ভারতে নিয়ে যাওয়াকে শান্তিবাহিনীর লক্ষ্য" (পৃঃ ১৬) এ জাতীয় বক্তব্য পেশ করে এক শ্রেণীর লোকের ভারত-বিরোধী উত্তেজনাকেও সদ্ব্যবহার করতে ভুলে যাননি।

মুখ্যতঃ জুম্মদের উপর সংঘটিত গণহত্যা এবং ঐ জাতীয় গণহত্যা প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করাই ছিল তাঁর করণীয়। অথচ তিনি সেসবের ধারেকাছেও না গিয়ে যাদের দ্বারা জুম্মদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত, সেসব অনু-প্রবেশকারীদের "পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে আমার মনে হয় বাঙালী সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিপদজনক" (পৃঃ ২২) বলে চিহ্নিত করলেন এবং অধিকতর অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারীদেরই জল্লাদী বাহিনী ভি ডি পি-দের শক্তিশালী করার সুপারিশ করে গেলেন। এর থেকে চরম পক্ষপাতিত্ব, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও অন্ধ সাম্প্রদায়িকতার আর কিই বা থাকতে পারে? পূর্বে উল্লেখিত লর্ড এভেবারী-এর দলিল থেকে উদ্ধৃতি দিলে বিচারপতি খানের দৃষ্টিভঙ্গির আরো পরিচয় মিলবে। ঐ দলিলে লর্ড এভেবারী লিখেছেন—"বিচারপতি খানের তদন্তের পরিধি ও প্রকৃতি দেখে আমি জেনেছি যে, তিনি ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন সদস্য যা, তার আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীনতাকে খর্ব করে"।

সুতরাং বিচারপতি খান বি এন পি'র উগ্র জাতীয়তাবাদী ও মৌলবাদী ভাবাদর্শ দ্বারা পুষ্ট হবে এটা নিশ্চিত। ঐ ভাবাদর্শে প্রভাবিত হয়ে জুম্ম নিশ্চিহ্নকরণ ধারাবাহিক পরিকল্পনার অধীনে নিজের সমর্থিত দলীয় সরকার ও সাঙ্গ-পাঙ্গদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যার তদন্ত সরকারী বয়ানের অনুরূপ হবে এবং সরকারী বয়ানকে বাড়তি প্রলেপ দিয়ে প্রকৃত ঘটনা ধামাচাপা দিতে আত্মপ্রণোদিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই বিচারপতি সুলতান হোসেন খানের তদন্ত রিপোর্ট পক্ষপাতদুষ্ট, জুম্ম বিদ্বেষী ও সর্বোপরি হাস্যকরও বটে।

THE LOGANG INQUIRY COMMISSION REPORT

RE-AFFIRMING THE GOVERNMENT STATEMENT

ONE

The Inquiry Commission of the Logang ethnocide published its report on 7 October, 1992. It is the first inquiry report published on the ethnocide of the Jumma people perpetrated by the Bangladesh Army and Muslim infiltrators. No inquiry report was published before although Judicial or Government Inquiry Commissions were formed on the Massacres of Kalampati, Longudu etc. Henceforth, the government of Khaleda Zia and Justice Hossain Khan, Chairman of the one man Inquiry Commission deserves thanks for publishing Inquiry Report reluctantly under pressure of strong public opinion at home and abroad.

Justice Sultan Hossain Khan submitted Inquiry Report to the Home Minister on 20 August, 1992, which mysteriously was published after one and half month. It is ridiculous that the published report basically does not differ from the government statement. There is similarity of context of both the statement. So, when a BBC commentator mockingly asked the causes of similarity of the two statements Justice Khan replied ; "Evidence and circumstances will prove it." He tried to evade the main context supporting the government statement as objective based on fact. It is the question as to what extent his Inquiry Report was impartial and unbiased. To what extent his recommendation were objective and practical ?

TWO

First the causes of Logang ethnocide identified by Justice Sultan Hossain Khan be discussed. Justice Khan summarily noted the causes of the ethnocide thus : "The incident is Logang, ... is the result of the planned objective of the insurgents. The armed Shanti Bahini killed a Bengalee boy named Kabir Ahmed and seriously injured 2 others after attacking them while they were grazing cattle in the field near the village, and it was aimed to creat tension between the Bengalee and tribals ..... (Page 16). Mainly he came into the conclusion depending on the statements of the VDPs, Ansars, infiltrated Muslims of the village, Army and civil officers. To waht extent, for obvious reasons, their statements were impartial and based on facts ? In this regard, one example can be cited :

One woman named Shova Chakma of Khagrachari fled to Tripura, India when her husband was killed by Army and Bengalees in the ethnocide of 1986. The tragic and horrible death of her husband spread out far and wide. Strong protest cropped up against his death in many influencial international fora. Bagladesh Government to by-pass the odd position permitted Darek Davis, a journalist of the Far Eastern Economic Review to come to Khagrachari. The Army and civil officers shew to Darek Davis a fake Shova Chakm, who was compelled to state that her husband was not death. Numerous such example can be cited. The government has been publishing conspiratoral manipulated and motivated news in the Goabalion style to conceal its nefarious activities and to serve its vile interest with the help of Army and civil officers. The government tried much to suppress the Logang incideat and making Shanti Bahini responsible for it. After the incident the news of 'killing 11 and ablazing some hundreds of houses by Santi Bahini attack' was published in the National News Papers and supplied to foreign radio medias by the help of Aamy and civil officers. Therefore, it can be easily grasped as to what exteat the witnesses of the Army, infiltrators

and local Civil Officers would be true based on fact. On the other, Justice Khan considered their witnesses as in fallible and asserted the presence of Shanti Bahini in the incident. He remarked : " ... armed insurgent appeared behind the hillock on which Chakma village was situated." (Page 16)

Justice Khan weighted little to the witnesses of Logang cluster villagers, victims and witnesses from 16 to 42. On the other, he remarked : "They have however refused to state or accept the suggestion that Shanti Bahini or any miscreant armed with fire-arms came to the place of occurence and attacked the Bengalee or Chakma villages" (Page 8). Depening on the witnesses of Habilder Nurul Islam, 57 witness, O/C (Officer-in-charge) and Asstt, S/I (Sub-Inspector) Justice Khan pointed out : " ...no alamat or shells of cartridges could be found from where the Shanti Bahini alleged to have fired" (Page 12). Despite that he made the Shanti Bahini responsible for the incident. So, giving final judgement without proof and on the verbal statement of one side only, which can not be considerd to be a justice of worthy jadge. He mentioned 'armed insurgent' to justify the firing of the VDPs, Ansar and BDR and pointed out ".....insurgent who might not be armed with fire-arms..... ....." to establish the truth..... killed Kabir Ahmed cutting his throat with dao" (Page 20). Justice Khan would not give self-contradictory report if his justification was not one sided and bias. The Santi Bahini possss arms who could shoot down the witnesses of Kabir Ahmed if they would attack. Then they would not need killing of Kabir Ahmed by hacking with dao. Therefore, where there no traces of 'alamat' or shells of cartridges on the place of occurence and also negated the statements of the eye-witnesses, such self-contradictory report of Justice Khan emply testifies that Shanti Bahini were not involved in the incident and Kabir Ahmed was not killed by them.

Two more causes of the Logang ethnocide ineluding the caused traced out by Justice Khan were published in the papers home and abroad. First, dead Kabir Ahmed was mentally abnormal. While playing, he quarelled with other shepherds and attacked two of them with dao. He died by hacking other two boys. In concealing the fact the boys ran homes and spread up the news that they were attacked by Shanti Bahini. Experiences shows that the infiltrators always tended to ascribe their faults and offence upon the Jumma people when failed to remove troubles created by them. But, Justice Khan never counted it. Secondly Kabir Ahmed attempted to rape one Gita Chakma while collecting wood from nearby grazing field. When shouthed her husband came to her rescoue from the nearby jungle and killed Kabir Hossain by hacking. He injured other two boys but was killed by them. On the statements no. 62 witness, Mintu Bikash Chakma and no. 64 witness, Jagadish Chandra Chakma Justice Khan started : "A tension was prevailing in the locality on account of punishment inflicted by the local arbitrators i.e. the Chairman of the Union Parishad on account of attempted assault upon a Chakma woman by deceased Kabir Ahmed" (Page 6). This proves that Kabir Ahmed died in a vain attemt of raping Gita Chakma.

It was known that Gita Chakma took shelter in the refugees camp in Tripura after the incident. In the news paper it was published that journalists in Tripura received interview from her. But Justice Khan never felt the need for witness from Gita Chakma, who was a very important eye-witness of the incident. Therefore, it can be commented that the causes of the Logang ethnocide discovered by Justice Khan have no foundation.

THREE

What Justice Khan concluded regarding the

number of causalties in the incident is : "In these view of evidence and circumstances, I have no hasitation to hold that the number of death did not exceed more than 12 tribals" (Page 19). There were a number of sources on the number of death in the incident—government, Chatra Parishad (Student Council), Jana Samhati Samiti (JSS), eye-witnesses and victims, retion distribution office in the cluster village and the like. It was found that Justice Khan valued the list of the government only. He laid importance more on the statement like Brigade Commander, Khagrachari, O/C, Asstt. S/I, TNO (Thana Nirbahi Officer), Medical Officer, Panchari, infiltrators, etc. They were all government men. It was, as if, varification of the governments statement with government men. It is not unknown to Justice Khan that during Bangladesh regime one dozen ethnocides were perpetrated serially upon the Jumma people by the Army, infiltrators and local civil Administration. The Logang ethnocide is not exclusive of these. So, the inquiry Procedure of Justice Khan was nothing but a jugglery just like putting the thief on the dock as witness for thiefing. He discarded the witness of the intellectualists Shishir Moral, Shara Hossain, Mostafa Faruque and Razalin who came to visit Khagrachari alongwith other 23 at the invitation of the 'Boisabi' during incident in this way :—"When they met with Brigadier Sharif Aziz in Khagrachari he told them that the number of death is 138. I asked Brigadier Sharif Aziz.... He denied having said so to these witness" (Page 9). Likewise, he discarded the witness of Chandra Sagar Chakma thus : "Chandra Sagar Chakma, witness no. 71 who alleged that he saw 150 dead-bodies but strangely when the Region Commander, Brigadier Sharif Aziz came to the place of occurence on the next day he wanted the dead bodies of 11 Chakma tribals for private cremation" (Page 18-19). On the other, regarding 138 dead-bodies of the 'Chatra Parishad' he remarked : "The Administration has produced or placed on record papers to show that several persons who have been shown to be dead in the statement of Pahari Chatra Parishad in journal Radder are alive and the local Administration has produced about 22 of them" (Page 18).

It is strange to think how Justice Khan confirmed the rest were alive excluding 22 on the record submitted by the Administration. He could prove whether alive or dead of those 138 visiting Logang cluster village physically. Thus, it is evident that he failed to prove the survival of the rests excluding alive 22 on the record of the Administration. In reality, those people died in the incident. On the other hand, he did not compare the ration list of the Gucchagram, the list of 27 killed persons published in a JSS booklet and the statement of directly affected victims taken shelter in Tripura refugee camps. He only knows how did the adjust the number of more than a thousand such Jummas. It was not mentioned in the report that whether they were killed or fled to Tripura. Some dead-body collecors namely Sukhmani Chakma, Lalya Chakma, Sunayan Chakma and Tusta Mani Chakma informed that they counted 150—200 corpse. Similarly, another 42 Jumma who returned from refugee camps in the previous night of the incident were missing. So, it is sure that the number of deaths might be more than 12. From a reliable source it came into the light that he found 45 dead persons from the witness of some eye-witnesses barring others, news went on that the Medical Officer, Panchari felt giddyness to see numerous dead bodies when he was called in for treatment of the wounded persens on the place of incident. But, none will confess that now as that of Brigadier Sharif Aziz, who himself told 138 deaths but later denied.

Justice Khan in his Inquiry Report remarked :

"It is impossible to dispose of such a large number of dead bodies and / or to remove them and or hide them in any place because such a large number of dead bodies can not be removed except by vehicles and they are to be disposed of near the road and that any such disposal of dead bodies can not be concealed"—(Page 19). Such an arguement is not at all acceptable. Khagrachari, is, as if, a region in the media eval age having no jeep, pick-up, military lorry and other vehicles. Who can challenge that the dead bodies were not stolen away ?

In his report Justice Khan remarked : ' They (23 intellectualists) were prevented by the local Army Officers from going towards Logang allegedly for security reasons" (Page 9) and "11th April, 1992 Boishista Moni went Logang village and saw the dead body of his wife alongwith other dead bodies but the authorities refused to give him the dead body" (Page 9). Such restriction imposed on those people testify that the dead bodies were stolen away. There was no reason for blockade of 23 intelectualists to go to Logang or not return the dead body of the wife of Boisista Moni Chakma when the hated members of the people of the Zilla Parishad (District Council) and their Associates were allowed to go there. It is difficult to think how Justice Khan spoke strange delirium for impossibility of stealing away the dead bodies when thousands of dead bodies or mass graves killed by Pakistan Army during the war of Bangladesh independence could not trace out till now.

FOUR

Justice Khan called for 101 witnesses, during inquiry of the Logang ethnocide. They were the Army personnel, infiltrators, men from civil Administration, government puppeets, eye-witnesses and victims of the ethnocide, Bengalee intellectualists, political party men and other Jumma people. The Army personnel, man of civil Administration are government men and the infiltrators are fed by the goveanment. The government has been implementing its plan and programmes with the help of these three groups of of people. These people carried out about one dozen ethnocides till now and in the Logang ethnocide too, they had direct hands. Jt is said that these people are incredibly expert in the intrigue of concealing their own misdeads and faults. So, their witness can never be true bassed on fact. Their witness means witness of government. It is curious some how Jastice Khan trusted the witnesses of those people, who perpetrated the Logang ethnocide.

Similarly, the government puppets are, always, included to the government to earn bread and butter. So, their witness is not acceptable. Of political parties, many politicians view the incidents of the Chittagong Hill Tracts (CHT) more on communal angle than Party ideology point of view. The recent communal riot in Dighinala carried out by the political parties testifies it.

In the Logang ethnocide the witness of eye-witnesses and victims of the incident, Bengalee intellectualists and other Jumma people were more reliable. Their witnesses appear to be more objective. Particularly, the witnesses of eye-witnesses and the victims of the incident were trust worthy. A fraction of eye-witnesses and victims of the incident fled to Tripura, India for security of life after the incident and the rests could not escape breaking up the military cordoing. Justice Khan collected witnesses from these people only. It is easily graspable whether eye-witnesses and victims of the incident would be able to express their un-exprssed sorrows open heartedly and objectively in a state where one becomes a prey to constant oppression, where the Jumma people pass their anxious moment in a terror striken situation, who think 'Life is not ours' and where the sword of the Army is help up. More clear information about the Inquiry Report of Justice Khan would be

available from the letter of Lord Avebury, Chairman of the uman Rights Commission of the House of Common and member of the House of Lord, Great Britain written to Tristan Gavel, Foreign and Common Wealth State Minister, Great Britain. Lord Avebury wrote : "I am informed that most of the witnesses were Govt. supporters. No doubt, as I forecast, the Jumma eye-witnesses afraid to come forward, and I do not believe any guarantees of immunity were offered to potential witnesses. Their names would be known to the armed forces, and if their evidence was unfavourable to the military, they would have every reason to fear reprisal."

On the Inquiry Report the Asia Watch remarked : "Nothing is said of the circumstances of the interviews in Khagrachari, it is said they were taken on the second floor of the Circuit House and the witnesses had to pass through a briefing of the Army on the first floor. It is claimed by some Chakma leaders that some witnesses who had lost family members failed to mention it out of fear."

Justice Khan did not collect witness from those witnesses sheltered in Tripur, who would be able to witness before him there free of fear of Army. The wounded victims, dead body carriers, dead person's relatives, Gita Chakma, a potential witness of the incident and even terified government agents of the Resistance Committee or so called 'Gukruk Bahini' all were available in the refugees' camp in Tripura.

On the other, he did not talk to the Shanti Bahini whom he made responsible for the incident blaming them one sidedly. So, Justice Khan in interview with the BBC South Asia Services, answered to a question with caprice and laughing that Shanti Bahini live in India He had no chance to contact and talk to them. Such remark made by him politically objected. It was a vain attempt to misguide the world opinion raising the slogan of so called intervention by India in the internal affairs of Bangladesh. He could communicate with JSS through the Liaison Committee acceptable by both Bangladesh government and JSS when failed to find out alternative way. The JSS would welcome it. He followed neither of the two ways. Thus, the impartiality and objectivity of the witness selecting 101 witnesses is not out of question.

FIVE

Justice Khan made some recommendation inconformity with geographical, Socio-economic and historical reality of the region to stop such incident. The most serious recommendations were land survey and deployment of Army. Regarding land survey he remarked : "It is high time that land survey should immediately be started for preperation of records as to titles and possession of owner or claiments of land. If land survey is made a substantial cause of tension and enimity between the 2 communities would be eradicated." (Page 21)

Although land grabbing is one of the main factors in the conflicts between the Jumma people and Bengalees, not the main for solution of the problem. The real and main problem is political. In no way it could be solved without adopting political process. The problem will be more complex if it solved other than political means. Therefore, recommendation for land survey of Justice Khan is starange and ill motivated.

The collective ownership of land titles has com down in the Jumma society tradationally. The traditional use of hills for Jum cultivation and gardening including home steads through they system of natural division among the Jumma people, land titles and ownerehip based on the occupation of land have been recognize in Jumma society. So, it is impossible on the part of the Jumma people to submit land documents if land survey is made. Besides, many of them who had documents on land settlement lost having been rooted out in the terror-struk political

situation in the region. On the other, more than 55,000 Jumma refugees are in Tripura till now.

No doubt, land survey is necessry. But before solution of the problem of the CHT, land survey can not be succesful. A land survey is carried out in stable and peaceful atmosphere ? Such atmospher is absent in the CHT. So, if land survey is made, at the moment, a large part of land once occupied by the Jumma people would be out of their possession and reduce into Khas land. Naturally, the infiiltrators would get chance for settlement of these Khas lands. As a consequence, the animity and conflict between the Jumma people and Bengalee will accelerate than ceasing. Undoubtedly, it can be said that Justice Khan made this clever-some nefarious recommendation with a view to ousting the Jumma people from their home steads.

Likewise, the other recommendation concerning deployment of Army is, too, vile and evidently under implementation. In the recommendation, he remarked, "I went to put on record, the presence of Army units in the Hill Tracts would be necessary as long as the insurgency of the Shanti Bahini Continues" (Page 24). At the same time he said, "Village Deffence Party who should be given arms and training for protection..." (Page 24). Justice Khan recommended for solution of a Political problem militarily in lieue of political process. It is know to him ihat no government could solve the problem of the CHT for long two decades through vain attempt trying to solve it militarily. Moreover, the problem was made more eomplex by military terrorism, rape, arson, killing, religious persecution and other human rights violations perpetrated by the Army. The VDPs were in the forefront in the destructive activities. Jusstice Khan noted : "Ansars and VDPs members were each given 303 Rifles and 20 round ammunition and BDR personnel were given automatic or semi-automatic weapons with ammunitions" (Page 2) (according to the statements from 1 to 8 witnesses the Jumma people were killed by such armed personnel).

Is the recommendation for Army deployment by Justice Khan killing Jumma people as guinea-pig as that of Logang ethnocide ? At least the language and text of the Inquiry Report helps to develop such notion clearly. Like Zia, Ershad and Khaleda, he too, encouraged military activities thus : "Army has done a commendable job" (Page 22). Even conscience failed to oppose him from making such remarks : "Not a single case of extrajudicial execution as done elsewhere in some countries" (Page 23). Being a defender of justice and humanity such remarks from him was not desirable.

Therefore, the recommendations of Justice Khan were completely unrealistic, devoid of commonsense that manifest the charecteristic of fascism.

The Logang ethnocide is not a local or isolate or, sudden incident. So, if it is judged isolately and singularly no sound and impartial inquiry could be expected in one hand and, no real solution of a problem like Logang ethnocide could be found. On the other, the Logang ethnocide is the outcome of the CHT problem. Solution of such a tragic incident conists in the heart of the CHT problem. But, what Justice Khan discovered with his developed brain : "Insurgency of Shanti Bahini can be solved if India as a gesture of goodwill towards Bangladesh shows a little apathy towards Shanti Bahini in that country where they have their bases for recruitment, training and get supply of arms and ammunition" (Page23). No real solution of the problem could be possible from such motivated remarks in one hand, and to make such statement in not worthy enough for a Justice on the other.

The CHT is the perpetual home land for the ten multi-lingual indigenous Jumma people. The Jumma people posses distinct national identity and differ

from the majority Bengalee Muslims of Bangladesh in the spheres of society, social culture, language, physical and mental formation, geographical atmosphere, history, economic life etc. Realising this fact the British government introduced the CHT Regulation—1900 (1 of 1900). No outsider was allowed to enter and settle in the CHT under this regulation. Pakistan government could not repeal the Regulation—1900 explicitly in the Pakistan constitution of 1956 and 1962 realising separate identity of the Jumma people. But after independence of Bangledesh the rulers found active in the heinous conspiracy of reducing the Jumma populated CHT into a Muslim populated region violating the Regulation—1900 (1 of 1900). The Process of destruction of the Jumma people is being implemented under the programmes of the Jumma destruction policy systematically infiltrating lacs of Bengalee Muslim in the CHT through nefarious activities such as other ethnocide, land grabbing, millitary terrorism etc. On the whole, the surreptitious policy of Bangladesh govenment on the CHT is : "We want the land and not the people". The Logang ethnocide is successful emplementation of its systematic conspiracy. So, from historical point of view the ceasation of an incident that happened in Logang is to be found out. It is not goodwill of India or deployment of Army and land survey, but through acheiving the just and perpetual right that the real solution of such incident can be made only.

SIX

Justice Khan was guided more by communal and expansionist sentiment other than by justiee, honesty and noble attitude while conducting inquiry into the Logang incident. He became so sentimental that he never hasitated to remark : "The cruelty committed upon the Bengalee community by the insurgents" (Page 21), and kept no space to analyse the causes of the incident in sound and could brain politically. Even he failed to check the delicacy of eyes expressing such an onesided remarks : "From 1980 to 1991 attack of Santi Bahini resulted in 952 deaths, 652 injuries and 411 kidnappings of Bengalees" (Page 21). But, he kept a side nakedly and brazently giving the number of dead Jumma people in different ethnocides combinedly carried out by Army and Muslim infiltrators in systematic operations in collusion with the civil Administration under the Jumma destruction policy. For example in 1971 in Dighinala 10, Panchari 47, in 1980 in Kalampati about 300, in 1981 in Matiranga-Belchari about 300, in 1984 Bhusan Chara 62, in 1986 in Panchari-Matiranga-Khagrachari 50, Rambabu Dheba 42, Changrachari 18, in 1988 in Baghaichari 36, in 1989 in Longudu 32 and in 1992 in Malya 18 were killed.

He finds no political justification when the infiltrators grab the lands of the Jumma people, kill and rape the helpless Jumma people if they become prey to Shanti Bahini. Could he tolerate if so affected ? Could he tolerate the killing of Pakistan Army ? Those Muslim settlers were given settlement in the CHT illegally violating the Regulation of—1900. There is no threat for lossing national existence and motherland to the majority Bengalee Muslim if the Jumma people are given setllement in the plain District of Bangladesh. On the other, it is not applicable to the Jumma people. They are lossing their national existence and motherland. Ignoring the above logical justification, Justice Khan remaked : "... ... as citizens of Bangladesh like any other tribals who have settled and acquired properties in the towns of the plain Districts" (Page 21) and undermining the charter of Demand of the Jumma people and the CHT Regulation—1900 (1 of 1900) to raise the question of law by Justice Khan, a law which was made by force of majority, without historical reality, it can not but be the outcome of communal and anti-Jumma hatred.

He left no stone unturn to spread out immense hatred against the Jumma people remarking on the Logang ethnocide as 'planned objective of the insurgents'. He abused them giving up all moral conscience in one hand and provocated to oust them terming as outsiders on the other. Even, he did not forget to use utmost — the anti Indian sentiment to a section of the people when remarked :—"The aim of Shanti Bahini is to take tribals to India so that they could recruit and train a large number of insurgents in Indian basis and operate in Hill Tracts" (Page 16).

Chiefly, it should be his main aim to inquire into the causes of the incident and to find out the ways and means for stopping ethnocide on the Jumma people. He thought nothing on it and instead thought for the security of the infiltrators by whom the security of the Jumma people endangered. He remarked : —"... ... ... from the situation at present obtaining in the Hill Tracts it appears to me that the safety of Bengalee community is in danger" (Page 22) and who recommanded for arms and training for the infiltrators to make the butcher forces er, VDPs more powerful. There is no such worst partiality, extrem nationalism and blind communalism as this. The attitude of Justice Khan could be known more clearly from the letter of Lord Avebury. He wrote, "I have looked into the scope and nature of Justice Khan's inquiry, and I have to point out first that he is a member of the Bangladesh Nationalist Party, the ruling Party, which does not inspire confidence in his independence."

Therefore, it is clear that Justice Khan would be influenced by the extrem Nationalism and fundamentalist ideology of the Bangladesh Nationalist Party. No doubt, having been influenced by the Party ideology the Inquiry Report of Justice Khan of the Logang ethnocide perpetrated by his Party government through its men under the programmes of the Jumma destruction policy systematically, would be similar to the government statement and be encouraged to suppress the real incident re-affirming the government statement. So, the Inquiry Report of Justice Khan is one sided, Jumma jealousy and above all ridiculous.

সংবাদ

সরকার ও জন সংহতি সমিতির ৮ম বৈঠক

খাগড়াছড়ি। গত ২৬শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ও জন সংহতি সমিতির মধ্যে ৮ম বৈঠক খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত হয়। এটা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বর্তমান ক্ষমতাসীন বি এন পি সরকারের সাথে জন সংহতি সমিতির ২য় বৈঠক। এদিন যথারীতি লোগাং এলাকার দুদুকছড়া হতে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে হেলিকপ্টার যোগে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে নেয়া হয়।

সকাল ১০টায় দু'পক্ষের আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়ে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলে। এবারের আলোচনায় দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। জন সংহতি সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধিত ৫ দফা দাবীনামা ছিল আলোচনার মূল বিষয়। অত্যন্ত সৌহার্দ্য ও আন্তরিক পরিবেশে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনা অব্যাহত রাখার স্বার্থে উভয় পক্ষ ৩১শে মার্চ/৯৩ ইং পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতি, ফেব্রুয়ারীর ১ম সপ্তাহে ৯ম বৈঠকে মিলিত হওয়ার মতৈক্যে উপনীত হন।

বিকালবেলা দুদুকছড়ি যাত্রার প্রাক্কালে সন্তু লারমা সাংবাদিকদের জানান, বৈঠক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠক আরো হবে। ৩১শে মার্চ পর্যন্ত অস্ত্র বিরতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সার্কিট হাউজে প্রেস ব্রিফিংকালে মন্ত্রী অলি আহম্মদ জানান, গত ৫ই নভেম্বরের মত এবারও অত্যন্ত আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। উভয় পক্ষ অত্যন্ত খোলামন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সমস্ত সমস্যা আছে সকলের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেগুলোর সমাধান হবে। আজ অনেক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়নি আগামী এক মাসের মধ্যেই অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী/৯৩ এর প্রথম সপ্তাহে আমরা তৃতীয় দফা বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্যে উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছি। বৈঠকের শেষে সাংসদ শ্রীকল্প রঞ্জন চাকমা, জনাব বরকত উল্লাহ ভুলু এবং জনাব মোস্তাক আহম্মদ চৌধুরীও আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বলে জানা যায়।

এদিকে বিকালে জন সংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ দুদুকছড়ি পৌঁছলে কয়েক হাজার জুম্ম নর-নারী তাদেরকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। শ্রীসন্তু লারমা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ জুম্ম জনগণের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

এবারের বৈঠকে যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব অলি আহম্মদের নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করেন সাংসদ শ্রীকল্প রঞ্জন চাকমা, জনাব সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম, জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান (১), জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান (২), জনাব বরকত উল্লাহ ভুলু এবং জনাব মোস্তাক আহম্মদ চৌধুরী। জন সংহতি সমিতির অন্যান্য সদস্যরা হলেন—শ্রীরূপায়ণ দেওয়ান, শ্রীগৌতম চাকমা, শ্রীসুধাসিন্ধু খীসা ও শ্রীরত্নোৎপল ত্রিপুরা।

হেগ সম্মেলন

গত ১৩—১৫ নভেম্বর নেদারল্যাণ্ডের রাজধানী হেগে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হেগ ভিত্তিক হিভোস (HIVOS) এর ডিরেক্টর মিঃ ইয়ান রেণ্ডার্স ছিলেন এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা। পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার সংরক্ষণে নিবেদিত পূর্ব ও পশ্চিমের বিভিন্ন সংগঠন এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার্থে ও মানবাধিকার সংরক্ষণে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ এবং বাংলাদেশকে সাহায্যকারী সরকার, ব্যাংক, সংস্থা ও জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনকে জুম্ম জনগণের উপর মানবাধিকার বিষয়ে যথাযথভাবে অবহিত ও জড়িত করাই এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যে সংগঠনসমূহের সকল কার্যক্রমকে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী দু'ভাবে পরিচালনার আলোচনা করা হয়। স্বল্প মেয়াদী ও জরুরী বিষয়ের মধ্যে জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন, পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্যাডাস্ট্রেল সার্ভে, বনায়ন পরিকল্পনা, সন্ত্রাস দমন আইন, লোগাং হত্যাকাণ্ড ও পর্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান ও সমঝোতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে বাংলাদেশকে সাহায্য দানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সরকার, ব্যাংক, বহুজাতিক সংস্থা, এন জি ও, জাতিসংঘের ইউনিসেফ, শ্রম সংস্থা, ইউ, এন, ডি, পি, রিফিউজি হাই কমিশন প্রভৃতি সংস্থাকে জুম্ম জনগণের উপর মানবাধিকার লংঘনের বিষয়টি যথাযথভাবে অবহিত ও সাহায্য দানের ক্ষেত্রে সংযুক্ত করার কার্যকরী পদক্ষেপ

গ্রহণ করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সংগঠন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, যোগাযোগ স্থাপন ও অর্থ যোগান প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সম্মেলনের প্রথমদিনে প্রতিনিধিগণ অনানুষ্ঠানিকভাবে মিলিত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে পারস্পরিক মত বিনিময় ও সম্মেলনের আলোচ্যসূচী গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিনে যথারীতি আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য রাখেন জন সংহতি সমিতির ইউরোপীয় মুখপাত্র ডঃ আর, এস, দেওয়ান, ত্রিপুরার মানবিক সুরক্ষা ফোরামের সদস্য শ্রী গৌতম চাকমা, পাপাড়ী গণপরিষদের সভাতি শ্রী সুবোধ বিকাশ চাকমা, আনপো'র (UNPO) সদস্য চন্দ্র রায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সদস্য জেনেকি এরেন্স এবং নীল মার্টিন (বাংলাদেশ) প্রমুখ।

উইলেম ভ্যান স্কেনডেল ও ইয়ান রেণ্ডার্স যথাক্রমে সম্মেলনের ২য় ও ৩য় দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান ও মানবাধিকার সংরক্ষণে অংশগ্রহণকারী সংস্থাসমূহের সকল কার্যক্রমের যৌথ কর্মসূচী গ্রহণের ঐকমতের ভিত্তিতে অত্যন্ত সফলজনকভাবে সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শ্রী সন্তু লারমার সাংবাদিক সম্মেলন

বাংলাদেশ সরকারের সাথে জন সংহতি সমিতির ৮ম বৈঠকের পরদিন জন সংহতি সমিতির সভাপতি শ্রী সন্তু লারমা দেশের বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকদের সাথে এক সম্মেলনে মিলিত হন। সুদীর্ঘ একযুগ পরে এটাই হচ্ছে জন সংহতি সমিতির সর্বপ্রথম প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে ১৪ জন সাংবাদিকসহ পানছড়ি থানার নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন, যোগাযোগ কমিটির সদস্য জনাব মোহাম্মদ শফি এবং শ্রী হংসধ্বজ চাকমাও উপস্থিত ছিলেন। শ্রী লারমার সঙ্গে শ্রী রূপায়ণ দেওয়ানও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক লোগাং এলাকায় এই সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী লারমা দেড় ঘন্টা ধরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে শ্রী লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের পটভূমি ও গতিধারার পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতি সত্তা রক্ষার্থে জনসংহতি সমিতি সুদীর্ঘ ২১ বৎসর ধরে রক্তাক্ত সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। কেবলমাত্র জুম্ম জাতি সত্তাকে সাংবিধানিকভাবে অধিকার প্রদানের মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। তিনি বলেন—"আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদী নই। আমরা চাই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, 'এ রিজিয়ন উইথিন দি স্টেট'।" তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'জুম্মল্যাণ্ড' হিসেবে ঘোষণা করে জুম্ম জাতি সত্তার স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান জানান। সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরের সময় তিনি জুম্ম জাতীয় সত্তার পূর্ণ বিবরণ দেন। তিনি আরো বলেন "পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা একটি রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করতে গেলে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল, সাংবাদিক ও শিল্পীসমাজকে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।" তিনি সাংবাদিকদেরকে ঐ সমস্যার দ্রুত সমাধানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরকালে তিনি সরকারের থাথে অনুষ্ঠিত ৮ম বৈঠক সম্পর্কে বলেন, আপেক্ষিকভাবে বলা যায় অগ্রগতি হয়েছে। সরকারের কাছে আমরা সংশোধিত ৫ দফা দাবী পেশ করেছি। সরকার যদি বলেন, বেশী দাবী করেছি, তাহলে বলবো, সরকারের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে। ভূমি প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জোর দিয়ে বলেন, ষড়যন্ত্র করে যারা পার্বত্যাঞ্চলে ভূমি বেদখল করেছে তাদেরকে জুম্ম জনগণের ভূমি ফেরত দিতে হবে। যতদিন এটা করা না হবে ততদিন এই সমস্যার সমাধান হবে না। ভূমি আমাদের চাই-ই, এর জন্য এত রক্তক্ষয়।

পরিশেষে, তিনি সাংবাদিকদের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের আবেদন জানান। সম্মেলন শেষে তিনি সাংবাদিকদের সাথে বেশ কয়েকবার ফটো তোলেন। তিনি শান্তি বাহিনীর ফটো তুলতেও অনুমতি দেন। সম্মেলন চলাকালে সাংবাদিকদেরকে বাঁশের চোঙায় কফি, বোতল শীতল পানীয়, কেক ও সিগারেট দিয়ে আপ্যায়ণ করা হয়। বিকাল ৩টায় সাংবাদিক সম্মেলন শেষ হলে শ্রী লারমা, শ্রী রূপায়ণ দেওয়ান, শ্রী রক্তোৎপল ত্রিপুরা, শ্রী গিলবার্ড সাংবাদিকদের উষ্ণ বিদায় সংবর্ধনা জানান।

যুদ্ধ বিরতির সুযোগে ক্যাম্প স্থাপন

বাংলাদেশ সরকারের সহিত আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে জন সংহতি সমিতি গত ১০ই আগষ্ট একতরফাভাবে তিন মাসের যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে। এই যুদ্ধ বিরতির সুযোগে বাংলাদেশ সেনা সদস্যরা বাধাহীনভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় যৌথ টহলদান শুরু করে ও বেশ কয়েকটি সেনা

ক্যাম্প স্থাপন করে। জন সংহতি সমিতির এই যুদ্ধ বিরতির সুযোগে সেনাবাহিনীর যৌথ টহল ও ক্যাম্প স্থাপন আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির বিরুদ্ধে এক নগ্ন ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ। এ সময়ে স্থাপিত নয়া সেনা ক্যাম্পগুলোর কয়েকটি উল্লেখ করা গেল—

(১) বাকছড়ি যৌথ খামার ক্যাম্প, ৬২ নং সাবেক্ষং মৌজা, থানা—নানিয়াচর। ক্যাম্পটি ২৩-১০-৯২ ইং তারিখে স্থাপন করা হয়;

(২) তিনটিলা পেরাছড়ামুখ ক্যাম্প, মেরুং থানা, ২৩-১০-৯২ইং তারিখে স্থাপন করা হয়;

(৩) চংড়াছড়ি বড়াদম ক্যাম্প, মেরুং জোন, দিঘীনালা, ২৯-১০-৯২ইং তারিখে স্থাপন করা হয়;

(৪) প্রভিভাপাড়া ক্যাম্প, মেরুং, খাগড়াছড়ি, অক্টোবরে স্থাপন করা হয়;

(৫) উল্টাছড়ি ক্যাম্প, মেরুং, দিঘীনালা, ২৯-১০-৯২ ইং তারিখে স্থাপন করা হয়।

সেনাবাহিনীর যুদ্ধ বিরতি লংঘন

জন সংহতি সমিতির একতরফা যুদ্ধ বিরতিকালীন (১০ই আগষ্ট—১০ই নভেম্বর) ৫ই নভেম্বর বাংলাদেশ সরকারের সাথে জন সংহতি সমিতির ৭ম বৈঠক (বর্তমান সরকারের সহিত প্রথম) অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে উভয় পক্ষই ৩১শে ডিসেম্বর/৯২ইং পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতিতে ঐকমতে পৌঁছেন। জন সংহতি সমিতি এ যুদ্ধ বিরতি যথাযথভাবে মেনে চললেও সেনাবাহিনী বারবার যুদ্ধ বিরতি লংঘন করে চলেছে। উভয় পক্ষের যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার পরের দিন ৬ই নভেম্বর সেনাবাহিনীর একদল সদস্য বাঘাইছড়ি থানার (রাঙ্গামাটি) দজর পাড়ায় এক বাড়ীতে হামলা চালিয়ে শান্তি বাহিনীর এক সদস্যকে হত্যা, একজনকে ধৃত ও দুইজন গ্রামবাসীকে গুরুতরভাবে আহত করে। পরে অবশ্য ধৃত শান্তি বাহিনীর সদস্যকে প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দেয়া হয়।

৯ই নভেম্বর দুর্গামোহন কার্বারীপাড়া ক্যাম্প হতে মেজর মিজান (২৩ ই বি আর) গোলাবা পাড়ায় (উল্টাছড়ি) খাগড়াছড়ি, বিশ্রামরত দু'জন শান্তিবাহিনীর সদস্যের উপর এলোপাথাড়ি গুলি বর্ষণ করে। কিন্তু শান্তি বাহিনীর সদস্যদ্বয় পালাতে সক্ষম হয়। পরিশেষে সেনা সদস্যরা কয়েকজন গ্রামবাসীকে বেদম মারধর করে।

এছাড়া ২০শে ডিসেম্বর বড়াদম সেনা ক্যাম্পের একদল সেনা বানছড়াতে (দিঘীনালা) এবং ২৩শে ডিসেম্বরে বগাছড়িতে এবং ২৬শে ডিসেম্বরে তাংগুম (বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি) এলাকায় শান্তি বাহিনীর সদস্যদের উপর গুলি বর্ষণ করেছে। রাজনৈতিক বিজ্ঞ মহলের ধারণা সরকারের সাথে শান্তিবাহিনীর আলোচনা বানচাল করার লক্ষ্যে সেনা সদস্যরা এভাবে বারবার যুদ্ধ বিরতি লংঘন করে চলেছে। অবশ্য সেনাবাহিনী ও শান্তি বাহিনীকে যুদ্ধ বিরতির লংঘনের বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ করে আসছে।

২ জুম্ম বালিকা ধর্ষিতা

গত ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ৯২ইং নানিয়াচর জোনের চৌধুরীছড়া ক্যাম্পের রোড প্রটেকশনে ডিউটিরত ৪ সেনা সদস্য কর্তৃক ২ জুম্ম বালিকা দলীয় ধর্ষণের শিকার হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ—নানিয়াচর থানাধীন ছোট মহাপ্রুম মৌজার রামহরি পাড়াসহ মিস্ নিপনা চাকমা (১৭), পিতা—জেরবন্যা চাকমা ও মিস্ বোম চাকমা (১৮), পিতা—বীর চন্দ্র চাকমা দ্বয়কে চৌধুরীছড়া মোন পাড়ার আত্মীয়ের বাড়ী হতে নিজ বাড়ী ফিরার পথে চৌধুরীছড়া ক্যাম্প হতে ১২ কিঃ মিঃ দূরবর্তী রাস্তায় টহলরত উক্ত সেনা সদস্যরা আটক করে এবং জোর পূর্বক জঙ্গলে ঢুকিয়ে দেড় ঘন্টা পর্যন্ত দলীয় ধর্ষণ করে ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দেয়ার সময় সেনা সদস্যরা বালিকাদ্বয়কে জোর পূর্বক কিছু টাকা দিয়ে দেয় বলেও জানা যায়। শালীনতাহানির লজ্জায় বালিকাদ্বয় ধর্ষণের কথা ব্যক্ত করতে না চাইলেও পরে তারা তা প্রকাশ করে। শান্তি বাহিনীর যুদ্ধ বিরতি চলাকালেও সেনা সদস্যদের এহেন বর্বরোচিত ধর্ষণে তৎএলাকার জনসাধারণ তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বলে জানা যায়।

সেনাবাহিনী কর্তৃক ধর্মীয় পরিহানি

গত ২৯শে অক্টোবর/৯২ইং তারিখে কাপ্তাই ব্রিগেডের অধীন মগবান (রাঙ্গামাটি) জোনের নাড়াইছড়ি ক্যাম্পের ক্যাম্প কমাণ্ডার সুবেদার মোঃ সিরাজ, ৪৫ ই বি আর-এর নেতৃত্বে একদল সেনা নাড়াইছড়ি গুচ্ছগ্রামে আসার পথে জঙ্গলের দিকে তাক করে বেপরোয়াভাবে ২০/২৫ রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে এবং শান্তি বাহিনী দেখেছে এই মিথ্যা অজুহাতে গুচ্ছগ্রামে প্রবেশ করে নিরীহ জনসাধারণকে জিজ্ঞাসাবাদ ও মারধর করে। অবশেষে গুচ্ছগ্রামসহ বৌদ্ধ বিহারে সমবেত হয় ও জুতা পায়ে মন্দিরে প্রবেশ করে, যা কোন ধর্মের

জন্য অপমানকর। এরপর পবিত্র বৌদ্ধ মূর্তির সামনে রাখানো পানির গ্লাসগুলো নিয়ে নেয় এবং উপাসনা ঘরের মধ্যে ভাত রেঁধে মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করে। শান্তি বাহিনীরা ঘোষিত যুদ্ধ বিরতি যথানিয়মে মেনে চললেও সেনাবাহিনীর এধরণের জুম্ম বিদ্বেষী ক্রিয়াকলাপে জনমনে দারুণ হতাশা সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা যায়।

লোগাং গণহত্যা তদন্ত রিপোর্টের নিন্দা জ্ঞাপন

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত লোগাং গণহত্যা তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের উপর ৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থা যৌথভাবে নিন্দা জ্ঞাপন করেছে। চলিত ডিসেম্বর মাসে হল্যাণ্ডে উক্ত সংস্থার প্রতিনিধিগণ প্রকাশিত রিপোর্টের পর্যালোচনা এবং এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই নিন্দা জ্ঞাপন করে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, বিচারপতি সুলতান হোসেন খানের তদন্ত রিপোর্টটি সম্পূর্ণরূপে অপর্যাপ্ত। রিপোর্টটির বক্তব্য পরস্পর বিরোধাত্মক ও সামরিক বাহিনীর বক্তব্যের সমার্থক। উদাহরণ হিসেবে এতে উল্লেখ করা হয় যে, রিপোর্টে ১০ই এপ্রিলের গণহত্যাকে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী ও মুসলমান বসতিকারীদের কর্তৃক সংঘটিত বলে স্বীকার করা হয়েছে কিন্তু এতে কেবলমাত্র ১২ জন জুম্ম ও ১ জন বসতিকারীর নিহত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর রিপোর্টে জুম্ম জনগণ ও বসতিকারীদের মধ্যেকার সম্পর্ক সহিংস বলে উল্লেখ করা হয়, তদুপরি বসতিকারীদের আরো অস্ত্র সরবরাহের সুপারিশ করা হয়েছে। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও রিপোর্টটিকে অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বলে বর্ণনা করেছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো অভিযোগ করা হয় যে, জুম্ম জনগণ বিগত ২০ বছর ধরে সর্বপ্রকার মানবাধিকার লংঘনের শিকার হয়ে আসছে এবং বাংলাদেশ সরকার জুম্মদের উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে এখনও বহিরাগতদের বসতি দিয়ে আসছে। এতে আরো বলা হয় যে, জ সংহতি সমিতির স্বার্থে বর্তমানে সরকারের আলোচনা চললেও সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বনায়নের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যার ফলে ৪০,০০০ জুম্ম পরিবার বাস্তুহারা হবে। এছাড়া সরকার সামরিক ক্যাম্প স্থাপনের জন্য অতিসম্প্রতি বান্দরবান জেলায় ১১,০০০ একর জমি অধিগ্রহণ এবং জুম্মদের জমিতে বসতিকারীদের বন্দোবস্তি দেয়ার লক্ষ্যে ক্যাডেস্ট্রেল সার্ভে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

নিন্দা জ্ঞাপনকারী সংস্থাগুলো হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ক্যাম্পেন এর সাংগঠনিক কমিটি (OCCHTC) নেদারল্যাণ্ড, জুম্ম পিপলস্ নেটওয়ার্ক (JPN) ইউরোপ, আনপো (UNPO), পার্বত্য চট্টগ্রাম ক্যাম্পেন ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক (CHTCIN) লণ্ডন, আদিবাসী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (IWGIA) ও সার্ভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল (SI)।

নিউইয়র্কে সেমিনার

গত ২১শে নভেম্বর/৯২ নিউইয়র্কে ডাউনটাউন ম্যানহাটানের নিউ ফর সোশাল রিসার্চে "কমিটি ফর ডেমোক্র্যাসি ইন বাংলাদেশ" এর উদ্যোগে "বাংলাদেশের অপ্রধান জাতিসমূহের গণতান্ত্রিক অধিকার" শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সলিমুল্লা খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন কানাডার ম্যাকগীল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ আদিত্য কুমার দেওয়ান। তিনি তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, পাহাড়ীরা সব সময় আলাদা ছিল। এদের রয়েছে আলাদা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। তিনি বলেন, বাইরে থেকে লোক এনে পার্বত্য এলাকায় বসতি স্থাপনের মাধ্যমে পাহাড়ীদের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে।

পার্বত্য সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমাদের ভাষা-সংস্কৃতিকে সম্মান দিয়ে রাজনৈতিক ভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি বাহিনী সদস্যরা আজ অস্ত্র ধরতে বাধ্য হয়েছে। কারণ এছাড়া তাদের আর কোন পথ ছিল না শান্তি বাহিনী সদস্যরা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, সীমানা ও অখণ্ডতা বজায় রেখে একটি রাজনৈতিক সমাধানে আগ্রহী।

এছাড়া এ সেমিনারে অধ্যাপক আবিদ বাহার তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে রোহিঙ্গাদের সমস্যা তুলে ধরেন। বাংলাদেশের বিহারী সমস্যার উপর প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক সদরুল আহসান। সেমিনারে গঠিত প্রবন্ধসমূহের উপর আলোচনায় অংশ নেন, তারেক মাসুদ, ডঃ আহম্মেদ কামাল, সুব্রত বসু, মোঃ মুহসীন, আনিসুজ্জামান খোকন, জাহাঙ্গীর আলম, কাজী শামসুউদ্দীন, ডঃ সবাচাষী ঘোষণ, ডঃ আনিসুর রহমান প্রমুখ। আনুষ্ঠানে ডঃ আদিত্য দেওয়ান কবিতা চাকমার একটি চাকমা কবিতা বাংলায় পাঠ করেন। কবিতার নাম ছিল 'রুখে দাঁড়াবো না কেন?'

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারণা : তথ্য ও প্রচার বিভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি।